শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৭. যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফত-পরিচয় ও ছহীহ ঈমান হতে দূরে সরিয়ে রাখবে (فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফত-পরিচয় ও ছহীহ ঈমান হতে দূরে সরিয়ে রাখবে।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ

যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফত-পরিচয় ও ছহীহ ঈমান হতে দূরে সরিয়ে রাখবে।

....

ব্যাখ্যা: এখানে পুর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। দ্বীনের মূলনীতির ব্যাপারে কথা বলতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিনা ইলমে কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার হুকুম করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘‘এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’’। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৬) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

‘‘কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। অথচ তার ব্যাপারে তো এটা নির্ধারিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু বানাবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে’’। (সূরা আল হজ্জ: ৩-৪) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا

خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

‘‘আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো জ্ঞান পথ নির্দেশনা ও দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে। সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়। এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো’’। (সূরা আল হজ্জ: ৮-৯)

আল্লাহ তা‘আলা সূরা কাসাসের ৫০ নং আয়াতে আরো বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

‘‘আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না’’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

‘‘তারা শুধু ধারণা এবং তাদের এ যা চায় তারই অনুসরণ করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ হতে হেদায়াত আগমন করেছে। (সূরা আন নাযম: ২৩) এ অর্থে এমন আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

আবু উমামা বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا ضَلَّ قَوْم بَعْد هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجدَل ثُمَّ تَلَا تِلْكَ الْآيَة مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جدَلًا بَلْ هُمْ قَوْم خَصِمُونَ

‘‘হেদায়াত পাওয়ার পর কোনো জাতি কেবল তখনই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, যখন তারা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جدَلًا بَلْ هُمْ قَوْم خَصِمُونَ

‘‘এরা শুধু তর্কের উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়’’। (সূরা যুখরুফ: ৫৮) ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাসান ছহীহ।[1] আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ»

‘‘ঝগড়াটে লোকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত’’। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[2]

যে ব্যক্তি নিজেকে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের কাছে সোপর্দ না করবে, তার তাওহীদ নষ্ট হবে। কেননা যে ব্যক্তি হাদীছ দিয়ে কথা না বলবে, সে কেবল নিজস্ব মত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই কথা বলবে। সে সঙ্গে সে এমন লোকের তাকলীদ (দলিলবিহীন অনুসরণ)ও করবে, যে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে সুস্পষ্ট হেদায়াতের উপর নেই। এতে করে রাসূলের সুন্নাত থেকে সরে যাওয়া অনুপাতে তার তাওহীদ কমে যাবে। কেননা সে অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

‘‘তুমি কি তাকে দেখো নি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? (সূরা ফুরকান: ৪৩)’’ অর্থাৎ তার

এ যার ইবাদত করতে চায়, তারই ইবাদত করে। মূলত তিনটি বাতিল ফির্কার কারণেই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন,

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ... وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ... وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ... وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا

(১) আমি অবশ্যই অবগত আছি যে, পাপাচার মানুষের অন্তর মেরে ফেলে। আর গুনাহর কাজে আসক্তি অপমান ও লাঞ্ছনা ডেকে আনে।

(২) পাপাচার ছেড়ে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে অন্তরের জীবন। নফসের অবাধ্য হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তোমার কল্যাণ।

(৩) রাজা-বাদশারাই দ্বীনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে চরিত্রহীন পাদ্রী ও সন্ন্যাসীর দল।

যালেম শাসকরা তাদের নিকৃষ্ট রাজনীতির মাধ্যমে শরীয়তের উপর আপত্তি করে ও শরীয়তের বিরোধীতা করে এবং তাদের রাজনীতিকে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর প্রাধান্য দেয়। নিকৃষ্ট সন্ন্যাসীর স্থলাভিষিক্ত ঐসমস্ত আলেম-উলামা, যারা তাদের রায় ও বাতিল কিয়াসসমূহের আশ্রয় নিয়ে শরীয়তের দলীল-প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে। তাদের রায় ও কিয়াসগুলো আল্লাহ তা'আলার হারামকে হালাল করেছে এবং তার হালালকে করেছে হারাম, আল্লাহ যা বাতিল করেছেন, তারা তাকে মূল্যায়ন করেছে, আল্লাহ ও তার রসূল যা সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন, তারা তাকে খাস করে নিয়েছে এবং এমনি আরো অনেক অন্যায় করেছে।

এ উম্মতের মুর্খ সুফীরাই খৃষ্টানদের ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের আসন দখল করে নিয়েছে। এরাই প্রকৃত ঈমান ও শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এরা যাওক-রুচি, প্রেম-প্রীতি, আবেগ-অনুভূতি, মনের কল্পনা, আল্লাহর প্রেমের পাগল এবং শয়তানের ভ্রান্ত কাশফের আশ্রয় নিয়ে এমন নতুন দ্বীন তৈরী করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তাদেরকে দেননি। আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর মাধ্যমে যে দ্বীন প্রেরণ করেছেন এগুলোর মাধ্যমে তারা তাকে বাতিল করে দিয়েছে। ঈমানের হাকীকতগুলো বাস্তবায়ন করা হতে কেবল শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণাই মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে।

পূর্বেকার কিছু লোক বলেছে, যখন শাসকের আদেশ আল্লাহর শরীয়তের পরিপন্থী হবে, তখন শাসকের আদেশকে শরীয়তের আদেশের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আরেক শ্রেণীর লোক বলেছে, আমাদের বিবেক-বুদ্ধির যুক্তি যখন কুরআন-হাদীছের দলীলের বিপরীত হবে, তখন বিবেক-বুদ্ধির যুক্তিকেই প্রাধান্য দিবো। আর সুফী সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে, যখন আমাদের 'যাওক বা রুচি' এবং কাশফ শরীয়তের বাহ্যিক কোনো বিষয়ের পরিপন্থী হবে, তখন আমরা কাশফ[3] ও যাওককেই প্রাধান্য দিবো।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ তার অন্যতম মূল্যবান কিতাব إحياء علوم الدين –এ বলেন, প্রশ্ন হলো মানতেক ও তর্কশাস্ত্র কি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত নিন্দনীয়? না কি এটি মুবাহ?

এর জবাবে আমি বলবো, মানুষেরা এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে চরম বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইলমুল কালাম ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বিদআত ও হারাম। শির্ক ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার পাপাচার নিয়ে আল্লাহর কাছে হাযির হওয়া ইলমে কালাম নিয়ে তার নিকট হাযির হওয়ার চেয়ে উত্তম।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, মানতেক, ইলমে কালাম ও তর্ক শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। কেউ বলেছেন, ফরযে কেফায়া আবার কেউ বলেছেন, ফরযে আইন। শুধু তাই নয়; তারা আরো বলেছেন, এটি সর্বোত্তম আমল এবং সর্বোচ্চ আনুগত্য। এর মাধ্যএে তাওহীদের জ্ঞান পুর্ণরূপে অর্জিত হয় এবং এটিই আল্লাহর দ্বীনের পথে সংগ্রামের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, ইলমে মানতেক ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এটিই ইমাম শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বাল, সুফিয়ান সাওরী এবং সালাফদের মুহাদ্দিছদের মত। তাদের মতামতকে ইমাম গাজ্জালী স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সালাফদের সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে এটি হারাম। তাদের থেকে এ বিষয়ে যত উক্তি এসেছে তা উপরোক্ত কথার মধ্যেই সীমিত নয়।

আলেমগণ বলেছেন, ছাহাবীগণ ইলমে কালাম, মানতেক ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে চুপ থাকার কারণ হলো, তারা তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন এবং অন্যদের তুলনায় ইলমে কালামের পরিভাষা ও শব্দ চয়ন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। এ জন্যই তাদের থেকে দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো বিদআত ও ক্ষতিকর জিনিস বের হয়নি। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا

যারা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, তারা ধ্বংস হোক। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।[4] অর্থাৎ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার সময় বেশী বেশী ঘাটাঘাটি করা ও গভীরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্র যদি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে আদেশ দিতেন এবং কালাম শাস্ত্রবিদদের প্রশংসা করতেন। অতঃপর ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ আরো অনেক দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি অন্য পক্ষের দলীল উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন, আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য মত কোন্টি? এ প্রশ্নের জবাব ইমাম গাজ্জালী বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাতে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই রয়েছে। এর যে অংশের মধ্যে উপকার রয়েছে, তা আমাদের জন্য অবস্থাভেদে হালাল অথবা মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিব হতে পারে।

আর ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রের যে অংশ ক্ষতিকর হবে, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য হারাম। ইলমে কালাম ও তর্কশাস্ত্রে ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, তা সন্দেহ ছড়ায়, মানুষের আক্বীদাহ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এতে দ্বীনের উপর মানুষের দৃঢ়তা কমে যায়।

ইলমুল কালাম ও মানতেক-যুক্তিবিদ্যা শাস্ত্রে প্রবেশ করার মাধ্যমে মানুষের আক্বীদাহ এত দুর্বল হয়ে যায় যে সে ধীরে ধীরে সন্দেহপূর্ণ দলীলের দিকে ফিরে যায় এবং এতে লোকেরা মতভেদ করে থাকে। সুতরাং সত্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করার ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এটি বিদ‘আতী আক্বীদাহকে শক্তিশালী করে এবং মানুষের অন্তরে একে ছাবেত করে দেয়। আর ইলমে কালাম, মানতেক ও তর্কশাস্ত্রের পিছনে লেগে থাকার প্রতি তাদের মনের টান ও আগ্রহ প্রবল হয়ে থাকে। তর্ক-বিতর্ক করার কারণে যে গোড়ামি শুরু হয়, তা থেকেই এ ক্ষতির সূত্রপাত হয়।

ফুটনোট

[1]. হাসান: তিরমিযী ৩২৫৩, মিশকাতুল মাসাবিহ ১৮০, ছহীহ তারগিব ১৩৭।

[2]. ছহীহ আল বুখারী ২৪৫৭, ছহীহ মুসলিম ২৬৬৮।

[3]. বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সুফীদের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হচ্ছে কাশফ। সুফীদের বিশ্বাস হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে একজন সুফী সাধকের হৃদয়ের পর্দা উঠে যায় এবং তাদের সামনে সৃষ্টি জগতের সকল রহস্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাদের পরিভাষায় একেই বলা হয় কাশফ। সুফীরা কাশফের সংজ্ঞায় বলেছে,

بأنه: الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً

পর্দার অন্তরালে যে সমস্ত গায়েবী তথ্য ও প্রকৃত রহস্য লুকায়িত আছে তা পাওয়া ও দেখার নামই হলো কাশফ। কাশফ হাসিল হয়ে গেলে আল্লাহ এবং সুফী সাধকের মাঝে কোন অন্তরায় থাকেনা। তখন তারা জান্নাত, জাহান্নাম, সাত আসমান, যমীন, আল্লাহর আরশ, লাওহে মাহফুয পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারে। তারা গায়েবের সকল খবর, মানুষের অন্তরের অবস্থা এবং সাত আসমানে ও যমীনে যা আছে তার সবই জানতে পারে। এমনকি তাদের অবগতি ব্যতীত গাছের একটি পাতাও ঝড়ে না, এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না, আসমান-যমীনের কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। এমনকি লাওহে মাহফুযে যা আছে, তাও তারা অবগত হতে পারে, তাতে কিছু বাড়াতে পারে, কমাতেও পারে। এমনি আরো অসংখ্য ক্ষমতা অর্জনের দাবী করে থাকে, যা একমাত্র মহান আল্লাহর গুণ।

কাশফের একটি উদাহরণ:

তাবলীগি নেসাব ফাযায়েলে আমাল নামক বইয়ের মধ্যে কাশফের একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পাঠকদের জন্য আমরা এখানে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রহি.) বলেন: আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ে সে দোযখের আগুন হতে নাজাত পায়। আমি এ খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়লাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখেরাতের সম্বল করে রাখলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকতো। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখতে পায়। তার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সে যুবক আমাদের সহিত খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল এবং সে বলল, আমার মা দোযখে জ্বলছে, আমি তার অবস্থা দেখতে পেয়েছি। কুরতুবী (রহি.) বলেন: আমি তার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করছিলাম। আমার খেয়াল হল যে, একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশাইয়া দেই। যা দ্বারা তার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাহার কাশফ হওয়ার ব্যাপারটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হতে একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশাইয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষনাৎ বলতে লাগল চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেয়েছে।

কুরতুবী (রহি.) বলেন: এ ঘটনা হতে আমার দু’টি ফায়দা হল। এক. সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনেছি তার অভিজ্ঞতা। দুই. যুবকটির সত্যতার (তার কাশ্‌ফ হওয়ার) একীন হইয়া গেল। দেখুন: ফাযায়েলে আমাল, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০১ ইং। দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত)

[4]. ছহীহ মুসলিম ২৬৭০, মুসনাদে ইবনে আবী শাইবা।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8931

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন